১১

বাংলাদেশের জনসংখ্যা
Population of Bangladesh

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে উন্নয়নের জন্য বোঝা হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা আছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে জনসংখ্যা উৎপাদনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। অনেকে জনসংখ্যাকে উন্নয়নের সহায়ক শক্তি বলেও মনে করেন। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য উন্নত দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে আবার বাংলাদেশ বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। সম্পদ পুঞ্জীভুত হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ধনী শ্রেনীর হাতে। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়নি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের পক্ষে পরিচালনা করা হয়নি। এমতাবস্থায় জনসংখ্যাকে দারিদ্রের কারণ হিসাবে ভাবা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাপে বাংলাদেশে ব্যাপক জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। জন্মনিরোধক পদ্ধতির ফলে নারীর স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নত দেশসমূহের রাজনীতির বিরুদ্ধে দরিদ্র দেশগুলিতে প্রতিবাদের স্বর উচ্চারিত হচ্ছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলি হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : জনসংখ্যা অধ্যয়নের পদ্ধতিসমূহ
- পাঠ - ২ : বাংলাদেশে জনসংখ্যার সমস্যা ও সম্ভাবনা
- পাঠ - ৩ : নারীর উপর জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রভাব
- পাঠ - ৪ : জনসংখ্যা সঙ্কোচনের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ

পাঠ - ১

জনসংখ্যা অধ্যয়নের পদ্ধতিসমূহ
Approaches to the Study of Population

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- মালথাসের তত্ত্ব জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়
- পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা হয়
- টেকসই উন্নয়ন ও গনমুখী প্রকৃতিবাদ ধনী দেশসমূহের ভোগবাদিতাকে দায়ী করে
- নারীবাদী চিন্তাধারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে নারীর স্বাধীনতা হরণ বলে মনে করে

মালথাসের তত্ত্ব

আপনারা অবগত আছেন যে বাংলাদেশে দেশের মানুষ বা জনগণ নিয়ে আলোচনার সময় 'জনসংখ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি সংখ্যাবাচক শব্দ। আর দেশের জনগণ মানুষ, জনসংখ্যা নয়। অনেকে মনে করেন 'জনগণ', 'জনসংখ্যা' হয়ে যাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। বর্তমান পাঠে আপনারা জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মালথাসের মতে বৈষম্যমূলক আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা নয়,জন্মহার বৃদ্ধিই দারিদ্রের কারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের অধিবাসী মালথাস লিখেন যে জনগণের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি পঁচিশ বৎসরে তা দ্বিগুন হয়ে যায়। আর খাদ্যোৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ক্ষুধা, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ দেখা দেয়। তাঁর মতে বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নয়, জন্মহার বৃদ্ধিই দারিদ্রের কারণ। মালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ পরের শতাব্দীতেই দেখা যায় যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করায় মানুষের জন্মহার অনেক কমে যায়।

তারপরও মালথাসের তত্ত্বের অনুসারীদের সংখ্যা কমেনি। ১৯৭১ সালে মার্কিন জীববিজ্ঞানী পল এরলিচ তার *Population Bomb* গ্রন্থে ভয়ঙ্কর তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সব মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা পৃথিবীর ফুরিয়ে গেছে। ১৯৭০ ও ১৯৮০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বহু মানুষ না খেতে পেরে মৃত্যুবরণ করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি জনসংখ্যাকে যে কোন প্রকারে হ্রাস করার কথা বলেন। দেখা যায় যে ১৯৭০ ও ১৯৮০ সালের মধ্যে নিবিড় কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের ফলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যা কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। ১৯৭২ সালে পাশ্চাত্যের একদল বিজ্ঞানী যারা Club of Rome নামে পরিচিত তারা লিখেন যে ক্রমাগত খাদ্য, জ্বালানী শক্তি ও কাঁচামালের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। তাদের মতে এসবের কারণে দরিদ্র দেশসমূহে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে এবং পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও বৈদেশিক সম্পদের সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে শিল্প উৎপাদন বিঘ্নিত হবে এবং ফলে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

মালথাসের তত্ত্বের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে মার্কিন চিন্তাবিদদের Life boat ethics বা জীবনরক্ষার নৈতিকতায়। তাদের মতে দরিদ্র দেশগুলি এমন নৌকায় চড়েছে যে নৌকা ভার বহন করতে অপারগ। সুতরাং নৌকা থেকে প্রচুর মানুষ পানিতে পড়ে ডুবে মারা যাচ্ছে। এ অবস্থার জন্য দরিদ্র দেশই দায়ী কারণ তারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু ধনী দেশগুলির নৌকায় কিছু স্থান শূন্য আছে সুতরাং তাদের জন্য তিনটি পথ খোলা আছে। এক, তারা যারাই নৌকায় আসতে চায় সকলকে স্থান দিতে

পারে। দুই, শূন্যস্থান পূরণের জন্য কিছু মানুষকে নৌকায় তুলে নিতে পারে। তিন, কাউকেই নৌকায় স্থান না দিতে পারে। চিন্তাবিদদের মতে আমেরিকার উচিত হবে তৃতীয় পথটি বেছে নেয়া।

মানবসম্পদ তত্ত্ব

'একটি নতুন জন্মগ্রহন করা শিশু মানে আরো দুটি বাড়তি হাত এবং বাড়তি মস্তিষ্ক। কেবল খাওয়ার জন্য বাড়তি মুখ নয়।'

জনসংখ্যাকে মানব সম্পদ হিসেবে তুলে ধরে চীন। তারা মাও সে তুঙের বক্তব্য পুনর্বার উচ্চচারণ করে বলে 'একটি নতুন জন্মগ্রহণ করা শিশু মানে আরো দুটি বাড়তি হাত এবং বাড়তি মস্তিষ্ক। কেবল খাওয়ার জন্য একটি বাড়তি মুখ নয়।' এই ধারায় ভারতীয় অনুসারীরা বলেন যে মানব সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত উন্নয়ন করা না হলে দারিদ্র সৃষ্টি হয়। তারা আরো বলেন যে ভারতের দরিদ্র পরিবারগুলিতে অধিক শিশুকে অধিক আয় উপার্জনকারী হিসেবে দেখা হয়। জনসংখ্যাকে মানব সম্পদ হিসেবে যারা দেখেন তাদের মতে স্বল্প মেয়াদে দেখলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে অধিক জনসংখ্যা সম্পদের ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন কল্পনাশক্তি ও জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে। তাদের মতে জনসংখ্যার বিষয়টি মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত - যা অর্থনীতির হিসাবের বাইরের বিষয়। কোন দেশ অধিক জনসংখ্যা নিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে রাজী থাকতে পারে। এতে ধনী দেশসমূহের নাক গলানোর কিংবা জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য চাপ দেবার কিছু নেই। ধনী দেশসমূহের কাছে জনসংখ্যা হ্রাস করা যৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। তাদের যুক্তিতে মানবিক আবেদন নেই। তারা দেখতে পান না যে দরিদ্র দেশের মানুষ দারিদ্রের মধ্যেও হাসে, আনন্দ করে, ভালবাসে ও প্রশান্তিতে থাকে।

উন্নয়ন তত্ত্ব

উন্নয়ন হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর জন্মনিরোধক।

উন্নয়নবাদীদের মতে জনসংখ্যাকে মোকাবেলার জন্য উন্নয়নই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সমাধান। তাদের মতে উন্নয়ন হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর জন্ম নিরোধক (contraceptive)। ইউরোপের অভিজ্ঞতার আলোকে তাত্ত্বিকগণ জনসংখ্যার স্থিতিশীল অবস্থা (demographic transition) ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব জনসংখ্যাকে তিনটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করে। প্রথম পর্যায়ে আধুনিকতার পূর্বে জন্ম ও মৃত্যু হার অত্যাধিক থাকে এবং জনসংখ্যা স্থির থাকে অথবা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় স্তরে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কারণে মৃত্যুহার হ্রাস পায় কিন্তু জন্মহার উচ্চ থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ফলে বড় পরিবার তৈরীর ইচ্ছা কমে যায়। জন্ম ও মৃত্যুহার সমান্তরালে থাকে। এভাবে এই তত্ত্বটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিশেষত নারীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। প্রশ্ন আসে জন্মহার কি তাহলে প্রাকৃতিকভাবে কমবে? নাকি তা কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকগণ ব্যাখ্যা করেন যে ভারত দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে এবং তাদেরকে অবশ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভারতে গবেষকগণ পর্যবেক্ষণ করেন যে উন্নয়নের ফলে সামাজিক স্তর বিন্যাসে যেসব গ্রুপ উচ্চ পদ সোপানে পৌঁছে তাদের মধ্যে জন্মহার বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। সামাজিক পদসোপানে যারা মধ্য স্তরে আছেন তাদের মধ্যে জন্মহার কম। আর যারা নিম্নস্তরে আছেন সেই সব দরিদ্র মানুষের জন্মহার কমানোর কোন তাগিদ নেই।

পরিবেশ বিপর্যয় তত্ত্ব

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রা... সম্পদের অধিক ব্যবহা... প্রয়োজন হয়।

পরিবেশবাদীদের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনকল্যাণমূলক সেবা কমে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের মতে জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদন যার জন্য অধিক ভূমি ব্যবহার করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহার প্রয়োজন। একসময় সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে গেলে ক্ষুধা, দারিদ্র, মৃত্যু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধ

বেড়ে যাবে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও জনগণকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমানো সম্ভব। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাবে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অসম্ভব করে তুলবে। পরিবেশবাদীদের এক অংশের মতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা নতুন প্রযুক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব দেন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত জনসংখ্যা কমানো সম্ভব হবে। তা না হলে বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্বকরণ (sterilisation) এর নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। অন্য একটি অংশ স্থিতিশীল জনসংখ্যার হারের উপর জোর দেন। তবে তারা মনে করেন জোরপূর্বক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাধান আনা সম্ভব নয়। একটি মধ্যমপন্থী অংশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জনসংখ্যা পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের মতে জনগণ, সম্পদ, পরিবেশ ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ায় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন তত্ত্ব

চরমপন্থী পরিবেশবাদীদের বিপরীতে টেকসই উন্নয়নের ধারণা বিকাশ লাভ করে। এই ধারণার প্রবক্তাগণের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই সহনশীল সীমানা পার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় দুটি পথ আছে - পৃথিবীর ধ্বংস অথবা টেকসই ভবিষ্যত। এই ধারণা মোতাবেক পৃথিবীর ধ্বংস ঠেকাতে হলে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক, প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে যে সকল বস্তু একবার মাত্র ব্যবহার করা যায় তা বর্জন করে বারবার ব্যবহার করা যায় এমন বস্তু ব্যবহার করা। দুই, বারবার ব্যবহার করা যায় এমন বস্তুগুলির জন্ম ও বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ব্যবহার করা। তিন, পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা যাতে প্রকৃতি পরিশোধন করার পর্যাপ্ত সময় পায়। এই চিন্তাধারায় প্রবক্তাগণ প্রসঙ্গত জনসংখ্যার সঙ্গে ভোগবাদিতার সম্পর্ক নির্ণয় করেন। যেহেতু উত্তর গোলার্ধের দেশগুলিতে ভোগবাদিতা বেশী এবং তারাই কার্বন ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপাদন করে, সেহেতু তাদেরকেই কৃচ্ছতা নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রবক্তাগণের মতে পৃথিবীর পূর্বভাগের দেশগুলিকে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা আনতে হবে। এতে জ্বালানী শক্তির অপব্যবহার কম হবে এবং পরিবেশ বিপর্যয় কম হবে। উল্লেখযোগ্য যে এই ধারার চিন্তাবিদগণ দক্ষিণ গোলার্ধের অর্থাৎ দরিদ্র দেশগুলিকে অবশ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

উত্তর গোলার্ধের দেশ গুলিতে ভোগবাদিতা বেশী এবং তারাই বেশী কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন করে। সুতরাং তাদেরকেই কৃচ্ছতা সাধনের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

গনমুখী ও প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব

গনমুখী জনসংখ্যাবিদগণ জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে গণ্য করেন না। তাদের মতে জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সংখ্যা, ঘনত্ব কোন সমস্যা নয়। তাদের মতে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটার অর্থ হচ্ছে এর সঙ্গে দারিদ্র এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার জড়িত। আর সে কারণে এসবের ফলাফল হিসেবে সমাজে ন্যায় বিচারের অভাব দেখা দেবে। গণমুখী চিন্তাবিদদের যুক্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে না যদি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন, উন্নয়ন বৈষম্য সৃষ্টি না করে সমতা সৃষ্টি করলে এবং সম্পদ ভাগাভাগি করলে জনসংখ্যা কোন সমস্যা হিসেবে দেখা দিবে না। তারা মনে করেন যদি ভবিষ্যতে পৃথিবীতে খাদ্য সরবরাহ কমে যায় তার অর্থ এই যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা হয় নি। তার অর্থ এই নয় যে অধিক জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর মত পর্যাপ্ত ক্ষমতা ভূমির নেই। এই ধারার ভারতীয় চিন্তাবিদগণের মতে ভূমি ও পানির দুষ্প্রাপ্যতা কমানোর জন্য বিকল্প উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচের চাহিদা কমিয়ে আনতে হবে। যে সকল শস্য উৎপাদনে কম পানি প্রয়োজন সেগুলি চাষ করতে হবে। এবং কৃষিতে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করার পদ্ধতি বের করতে হবে।

এই ধারার প্রবক্তাগণের মতে জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে নৈতিক সমস্যা। মহাত্মা গান্ধীর উক্তিটি পুনরুত্থাপিত হয়- "পৃথিবীতে সকল মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ আছে, কিন্তু সকল মানুষের লোভ মিটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ নেই"। তাদের মতে দরিদ্র

...বীতে সকল মানুষের ...োজন মিটানোর জন্য ... সম্পদ আছে, কিন্তু সকল মানুষের লোভ ...মিটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ নেই।'

দেশসমূহে পরিবেশ, জনসংখ্যা ও দারিদ্রের সমস্যা সৃষ্টি হয় ধনী দেশসমূহের ভোগবাদিতার নীতির কারণে। সুতরাং ভোগবাদী ও বিলাসী জীবনযাত্রা কমাতে হবে এবং প্রতিরক্ষা খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তা বন্ধ করতে হবে। তার অর্থ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, ধনী ও ক্ষমতাশালীদের নৈতিকতা সংস্কার করা প্রয়োজন।

নারীবাদী তত্ত্ব

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নারীর শরীরকে পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

নারীবাদী চিন্তাধারায় নারীদের উপর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রভাব বর্ণনা করা হয়। নারীবাদী চিন্তাবিদগণ জনসংখ্যা প্রশ্নে ভাষার ব্যবহারের রাজনীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। যেমন, 'পরিবার পরিকল্পনা' শব্দটি দ্বারা সন্তান জন্মদানের জন্য সময় নির্ধারণের সিদ্ধান্ত বোঝায়। কিন্তু 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ' শব্দ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বল প্রয়োগ পূর্বক কোন বিশেষ শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গের জনসংখ্যা হ্রাস করা বোঝায়। তাদের মতে বারবার সন্তান জন্মদান কমালে নারীর স্বাধীনতা আসবে। কিন্তু জোরপূর্বক নারীকে জন্মনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করলে নারীর স্বাধীনতা খর্ব হবে। নারীবাদীদের মতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নারীর শরীরকে পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জনসংখ্যা বিষয়ে নীতি নির্ধারণে তাই নারীর বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

সারাংশ

এই পাঠে জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব চিন্তাধারা জনসংখ্যা কেন্দ্রিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে। যেমন মালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী খাদ্যোৎপাদনের হারের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক, যে কারণে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি হয়। এ তত্ত্ব অনুসারে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ দরিদ্র দেশসমূহে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটাতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তখন জনসংখ্যা অনুন্নয়ন ও দারিদ্রের সৃষ্টি করে না। আবার আন্তর্জাতিক রাজনীতি জনসংখ্যাকে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করে। কিন্তু পরিবেশ বাদীদের মতে উন্নত দেশসমূহের ভোগবাদী প্রবণতা, অতিরিক্ত জ্বালানী পোড়ানো ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। আবার প্রকৃতিবাদীগণ মনে করেন উন্নয়ন বৈষম্য সৃষ্টি না করে সম্পদের সুষম বন্টন করলে জনসংখ্যা কোন সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। Life boat Ethics বা জীবনরক্ষা নৈকিতকায় আমেরিকার কি করা উচিত বলে মনে করা হয়?
ক. সকল দরিদ্র দেশকে সহযোগিতা করা
খ. কোন কোন দরিদ্র দেশকে সাহায্য করা
গ. দরিদ্র হওয়ার পথ বন্ধ করা
ঘ. কোন দরিদ্র দেশকে সাহায্য না করা

২। কারা মনে করেন যে দরিদ্র দেশে পরিবেশ ও জনসংখ্যার সমস্যা সৃষ্টি হয় ধনী দেশসমূহের ভোগবাদিতার কারণে?
ক. উন্নয়ন তাত্ত্বিকগণ
খ. পরিবেশবাদীগণ
গ. গণমুখী ও প্রকৃতিবাদী তাত্ত্বিকগণ
ঘ. জনসংখ্যাবিদগণ

৩। "পৃথিবীতে সকল মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু সকল মানুষের লোভ মিটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ নেই" - উক্তিটি কার?
ক. মহাত্মা গান্ধী
খ. মাও সেতুং
গ. কার্ল মার্ক্স
ঘ. আব্রাহাম লিংকন

৪। "একটি নতুন জন্মগ্রহণ করা শিশু মানে আরো দুটি বাড়তি হাত এবং বাড়তি মস্তিষ্ক। কেবল খাওয়ার জন্য বাড়তি মুখ না" - মাও সেতুং এর এই উক্তির অর্থ কি?
ক. আরো অধিক হারে সন্তান জন্মদান করতে হবে
খ. জনসংখ্যা কোন অবস্থাতেই কোন সমস্যা নয়
গ. জনপ্রতি অল্প খাদ্য দিয়ে অধিক জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে
ঘ. মানব সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত উন্নয়ন করা হলে দারিদ্র সৃষ্টি হয় না

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা বিষয়ে পরিবেশবাদীদের অবস্থান কি?
২। নারীবাদীগণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কি ধরনের মতামত প্রকাশ করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মালথাসের তত্ত্ব কি? মালথাসের তত্ত্ব কিভাবে জনসংখ্যা বিষয়ক ধারণাকে প্রভাবিত করেছে?
২। জনসংখ্যাকে যারা সমস্যা হিসেবে মনে করেন না তাদের বক্তব্য আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

বাংলাদেশে জনসংখ্যার সমস্যা ও সম্ভাবনা
Problems and Prospects of Population in Bangladesh

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- বাংলাদেশে জনসংখ্যার অবস্থা
- জনসংখ্যাকে সমস্যা ভাবার কারণ
- জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা

জনসংখ্যার অবস্থা

বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা জানার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মানুষ গণনার ব্যবস্থা করা হয় আদম শুমারীর মাধ্যমে। কিন্তু দেখা যায় যে জনসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কাজ করে। প্রতি সেকেন্ডে উন্নয়নশীল দেশসমূহে কত মানুষ জন্ম গ্রহণ করে তা হিসাব করার জন্য জাতিসংঘের জনসংখ্যা ঘড়ি আছে। সে ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেটিকেই জাতিসংঘ সঠিক সংখ্যা বলে ধরে নেয়। বাংলাদেশে বাস্তবে মানুষ গণনার পর যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা তাদের বিশ্বাস হয় না। এ কারণে বাংলাদেশ সরকারকে আদম শুমারীর পর জনসংখ্যা এডজাষ্ট করে বৃদ্ধি করতে হয়। যেমন ১৯৭৪ সালে আদম শুমারীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাওয়া যায় ৭ কোটি ১৩ লক্ষ। পরে এ সংখ্যা স্থির করা হয় ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৮ হাজার। ১৯৮১ সালে আদম শুমারীতে জনসংখ্যা পাওয়া যায় ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৫২ হাজার। সরকার কর্তৃক এডজাষ্টমেন্টের পর এটি দাঁড়ায় ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার। ১৯৯১ সালে আদম শুমারীতে জনসংখ্যা পাওয়া যায় ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩জন। পরে সেটি এডজাষ্ট করা হয় ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫শত ৫২ জন। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার পেছনে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কাজ করে। কেবল বাংলাদেশ নয়, জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানোর ঘটনা উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২% হারে কমছে। ১৯৭৩ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ৩% যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে বার্ষিক ১.৭৫% এ দাঁড়িয়েছে। এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যার হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পঞ্চম কিন্তু বর্তমানে অবস্থান হচ্ছে ষষ্ঠ। এভাবে পৃথিবীতে অষ্টম জনবহুল দেশ বাংলাদেশের অবস্থান এখন নবম।

বাংলাদেশে মানুষ প্রজননের হার কমছে। ১৯৭৫ সালে এ হার ছিল ৬.৩৪% এবং ১৯৯১ সালে এটি হয় ৪.৩৩%।

বাংলাদেশে ১৫ বৎস জনসংখ্যা অধিক। বা আগামী দুই দশক b phase এ থাকবে।

বাংলাদেশে মানুষ প্রজননের হার কমছে। ১৯৭৫ সালে এ হার ছিল ৬.৩৪% এবং ১৯৯১ সালে এটি হয় ৪.৩৩%। তবে পূর্বে প্রজনন হার অধিক থাকায় এবং বর্তমানে মৃত্যু হার হ্রাস পাওয়ায় অতিরিক্ত প্রজননের সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে ১৫ বৎসরের কম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৩%। প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী নারী যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৯ বৎসর তারা মোট নারী সংখ্যার ৪৬%। জনমিতির সূত্র অনুসারে কর্মক্ষম মানুষের বয়স ধরা হয় ১৫ থেকে ৬৪ বৎসর। এই বয়স গ্রুপের যুবক/যুবতী (১৫ বৎসর) এবং বৃদ্ধ (৬৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে) এর অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে আশ্রিত (dependent) জনসংখ্যা স্থির করা হয়। বাংলাদেশে ১৫ বৎসরের কম জনসংখ্যা অধিক (৪৩%) হওয়ায় এ অবস্থাকে জনসংখ্যাবিদগণ bonus phase বা সুবিধাজনক পর্যায় বলে থাকেন। শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি বোঝা যাবে। বাংলাদেশে মধ্যস্থিত (median) বয়স ২৫ বৎসরের কম। ধারণা করা হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যস্থিত বয়স দাঁড়াবে ৪৫ এ। তার মানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০% এর

বয়স ৪৫ এবং তার উর্ধ্বে হবে, যার ফলে আশ্রিত জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। এ দিকে শ্রীলঙ্কায় ১৫ বৎসরের কম বয়স্কদের সংখ্যা ৫২% থেকে কমে ২০৪১ সালে ২৪.৬ এ দাঁড়াবে। ফলে ২০৪১ সালে শ্রীলঙ্কায় আশ্রিত জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৭২.৫%। জনসংখ্যাবিদগণ এ অবস্থাকে bonus phase থেকে burden phase এ উত্তরণ বলে থাকেন। বাংলাদেশ আগামী আরো দুই দশক যখন bonus phase-এ থাকবে তখন শ্রীলঙ্কা ২০০৬ সালের পরেই burden phase এ ঢুকে পড়বে। তার অর্থ বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে বর্তমানে এবং আগামী দুই দশকে মোটেও 'বোঝা' হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

বাংলাদেশে জন্মকালে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। ১৯৭৩ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রতি ১০০০ শিশু জন্মের মধ্যে ১৫৪ জন মৃত্যু বরণ করতো যা ১৯৯১ সালে কমে ৯১ এ দাঁড়িয়েছে। একইভাবে শিশু মৃত্যুর হারও কমেছে যেমন ১৯৮১-১৯৯১ এই দশ বছরে শিশু মৃত্যুর হার ৭২ থেকে কমে ৫১ হয়েছে। পূর্বে মানুষের মৃত্যু হার অধিক হওয়ায় আয়ুষ্কাল ১৯৪১ সালে ৩২ বৎর ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০ এর দশকে ৪৮ বৎসর হয়েছিল। পরবর্তীতে আয়ুষ্কাল আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮২ সালে ৫০ বৎসর এবং ১৯৯১ সালে ৫৫ বৎসর এবং ১৯৯৫ সালে ৫৮ বৎসর হয়েছে।

ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশে মানুষ প্রজননের হার হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের সম্পর্ক আছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন দম্পতিদের ৩.৭% ১৯৬৮ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যা ১৯৯৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬% এ দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদগণ ধারণা করেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশে বার্ষিক মাথা পিছু আয় ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সালে ০.৮% ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সালে বার্ষিক ২.২% হয়েছে। তবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নি।

জনসংখ্যাকে সমস্যা ভাবার কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার পেছনে কয়েকটি কারণ দেখানো হয়। প্রধানত বলা হয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দারিদ্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন কৃষির উপরও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবাদযোগ্য জমি ক্ষুদ্রাকৃতির হচ্ছে বলে অর্থনৈতিক উপযুক্ততা হারাচ্ছে। মাথা পিছু জমির পরিমাণ ০.২৫ একরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বৎসরের খাদ্য ঘাটতির বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর প্রায় ১৫.২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। জনসংখ্যার ঘনত্বের বিষয়টিও প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৮১ জন পর্যন্ত বসবাস করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও ধরা হয় কারণ মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩৩% বেকার। যে হারে বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব বাড়ছে সেই হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। তাছাড়া পুষ্টিহীনতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য ব্যতীত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাসস্থান, বস্ত্র ইত্যাদি মৌলিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ভূমি ছাড়াও পানি ও জ্বালানী শক্তির উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্রের কারণে মাথা পিছু আয় কম হওয়ায় জীবনযাত্রার মান নিম্ন ও সঞ্চয় ক্ষীণ হওয়ায় উন্নয়নের জন্য আবশ্যক মূলধনের যোগানও কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু উন্নয়নের সুবিধাও হ্রাস পায় যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি। যেমন ২০০০ সাল পর্যন্ত ৩৬৭ জনের জন্য একটি টেলিফোন থাকা উন্নয়নের জন্য মোটেও সুবিধাজনক নয়।

বলা হয় যে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যার সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশে দারিদ্রের পর পরিবেশকে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয় জনসংখ্যার কারণে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে এবং পানিসম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। দ্রুত নগরায়নের জন্যও জনসংখ্যাকে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৮% মানুষ শহরে বাস করেন। গ্রাম থেকে শহরে বিপুল জনসংখ্যা অভিবাসন করার ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ন হওয়ায় শহরের সুযোগ সুবিধা বন্টনেও সমস্যা দেখা দেয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও সন্ত্রাস বৃদ্ধির জন্যও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা হয়।

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ জনসংখ্যা নয়

বাংলাদেশে পর নির্ভরতা কাটিয়ে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে দেখার পূর্বে খুঁজে দেখতে হবে এদেশে অর্থনৈতিক গতিশীলতা না আসার কারণ কি। অর্থনীতিবিদগণের মতে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব, শিল্পের প্রসার ও বিশ্ববাণিজ্যের বিস্তৃতি এটাই প্রমাণ করে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী নয়। অনেকে জনাধিক্য চাপকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক বলেও মনে করেন কারণ তা উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে শিল্পোন্নয়নের পূর্বে উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা স্বল্পতা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল। তাছাড়া আর্থার লুইসের মডেল অনুসারে উন্নয়নশীল দেশসমূহে স্বপোষী খাতে বিরাজিত শ্রমিক সরবরাহ শিল্পখাতে নিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গতিশীলতা না আসার কারণ ভিন্ন। এখানে কি সামাজিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করা হয়েছে? উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি শ্রমশক্তিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে? জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শ্রমবিভাগ বিস্তৃত হয় এবং উৎপাদনে বিশেষীকরণ আসে যে বিশেষীকরণ অর্থনৈতিক সুবিধা আহরণে সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশের জনগণের মূল্যবোধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এ জনগণকে কি পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে? এখানে ভূমি ব্যবস্থায় বিরাজ করছে বিশাল অসমতা। কেবল ৬.২% গৃহস্থালীর পাঁচ একরের অধিক জমি আছে এবং তারা ৪০% ভূমির মালিক। অন্য দিকে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার শিল্প ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার নীতি গ্রহণ করায় সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে অল্পসংখ্যকের হাতে। নব্য ধনী শিল্পপতিগণ ব্যাংক থেকে বিপুল অর্থ ঋণ করে ফেরত দিচ্ছেন না এবং তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ নেই। সম্পদের অসম বন্টনের ফলে উন্নয়নের ফলাফল নিম্নস্তরের দরিদ্র মানুষের কাছে পৌছায় না। এমতাবস্থায় দরিদ্রের পক্ষে নীতিমালা প্রণয়ন করে দরিদ্রদের জন্য যথেষ্ট উন্নয়নের পদক্ষেপও গৃহীত হচ্ছে না। কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র এনে শস্য ফলানোর পাশাপাশি শাক সজি, মাছ, গবাদী পশু ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যাপক পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। কারণ সরকারী নীতি কেবল শস্য ও প্রধানত ধান উৎপাদনের দিকেই বেশী জোর দিয়ে থাকে। অ-কৃষিখাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় নি। সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয় নি। যেমন বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, আইন শৃঙ্খলাসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রযুক্তি ও তথ্য সরবরাহ খাতে উন্নয়ন ঘটানো হয়নি।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য পরনির্ভর বা উন্নত দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে সম্পদ পাচার হয়ে যায়। আবার বাংলাদেশে মানুষের ভোগ ধারাকে উন্নত শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের আলোকে পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বিদেশীরা উত্তোলন করে এবং তারাই মূল্য বেধে দেয়। বাংলাদেশের পাটের মূল্য বিদেশীরাই ঠিক করে দেয়। বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্প হবে, কোন ধরনের দ্রব্য উৎপাদিত হবে সব কিছু বিদেশী দাতা গোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু অন্য দিকে বাংলাদেশ থেকে উন্নত দেশসমূহে পণ্য রপ্তানীর বাধা নিরসন করা হয় না। এদেশ থেকে বিদেশে স্বাধীনভাবে বহির্গমনেরও ব্যবস্থা নেই। জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের একটি রাজনীতি। বাংলাদেশে পরনির্ভরতা কাটিয়ে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে।

মানব সম্পদের ধারণা

বাংলাদেশে দরিদ্র জন... পক্ষে অর্থনৈতিক প্রবৃ... চালনা করার পদক্ষেপ... হয়নি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন। মানব উন্নয়ন ধারণার মূল বিষয় হচ্ছে- মানুষ উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মানুষ শোষণের সম্পদ বা মাধ্যম নয়। মানব উন্নয়নের ধারণা শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও আয় গণনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের অবস্থান নির্ণয়ের একপেশে মাপকাঠি থেকে বেরিয়ে আসার একটি প্রচেষ্টা। এতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে সকল মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অপুষ্টি থেকে মুক্তি, বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদগণের মতে মানব উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। কিন্তু বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চালনা করার পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। যেমন শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান, কৃষিখাতের উন্নয়ন, গ্রামীন অ-কৃষি খাতের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্প ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানোর

পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। তাছাড়া সরকারের সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে মানব উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেই। বিনায়েক সেনের (১৯৯৬)[১] একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের ফলাফল ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে অসমভাবে বণ্টিত হয়। তার মতে সরকারের শিক্ষাখাতে যা ব্যয় হয় তাতে বাংলাদেশের অতি দরিদ্রদের চেয়ে ধনীদের ভাগ ১৪ গুণ বেশী। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েদের ভর্তি হবার হার ৩৮% এবং ধনী শ্রেণীর ৬৯%। সরকারী স্বাস্থ্য খাতের সুযোগ দরিদ্র শ্রেণী পায় ২৬% এবং ধনী শ্রেণী পায় ৪৮%, দরিদ্র শ্রেণীর কেবল ৪% এবং ধনী শ্রেণীর ২৭% এর স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা আছে। গ্রামাঞ্চলে পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী (real income) কম যদিও তা ১৯৭৩/৭৪ সনের দৈনিক ৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩/৯৪ সনে দৈনিক ১৭ টাকায় উন্নীত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকদের মজুরী একেবারেই নগণ্য। বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে এইসব সেবা খুব কম পৌঁছায় এবং যা পৌঁছায় তার গুণগত মান খুব নিম্ন। বাংলাদেশে ধনী ও দরিদ্রদের আয় বৈষম্য কমিয়ে দরিদ্রদের পক্ষে উচ্চমান সম্পন্ন সেবা প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব।

সারাংশ

সাধারণত বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে জনসংখ্যা উৎপাদনের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। যে কোন দেশের দক্ষ ও কর্মোক্ষম জনশক্তি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে এই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর। আর উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ পণ্য সামগ্রীর চাহিদাও বৃদ্ধি পাওয়া। চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি একই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন স্তরে যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, যখন বর্ধিত জনসংখ্যাকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগানো যায় না। তখন দেশের মোট উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি বলে অনুভূত হয়। তার অর্থ কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশি হলে সমস্যার উদ্ভব হয়। কাম্য জনসংখ্যা হচ্ছে যে জনসংখ্যা থাকলে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। মালথাসের তত্ত্ব অনুসরণ করে কেবল খাদ্য সামগ্রীকে জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে তুলনা করলে সঠিক বিশ্লেষণ হবে না। উন্নত দেশসমূহে খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এবং মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের মোট সম্পদের তুলনায় যদি জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে একে সমস্যা বলা যাবে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি যদি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিল্পোন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সরবরাহ, প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে তাহলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়।

[১] Sen Binayak, "*Economic Growth and Human Development in Bangladesh 1973-1995*", Journal of Social Studies, No. 74, CSS, Dhaka University, 1996.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। জনসংখ্যা bonus phase এ থাকার অর্থ কি?
ক. ৪০ বৎসরের কম জনসংখ্যা অধিক হওয়া
খ. ৩০ বৎসরের উর্ধে জনসংখ্যা অধিক হওয়া
গ. ২৫ বৎসরের কম জনসংখ্যা অধিক হওয়া
ঘ. ১৫ বৎসরের কম জনসংখ্যা অধিক হওয়া

২। জনসংখ্যা burden phase এ থাকার অর্থ কি?
ক. ১৫ বৎসরের কম জনসংখ্যা অধিক হওয়া
খ. ৪৫ বৎসরের উর্ধে জনসংখ্যা অধিক হওয়া
গ. ২৫ বৎসরের কম জনসংখ্যা অধিক হওয়া
ঘ. ৩৫ বৎসরের উর্ধে জনসংখ্যা অধিক হওয়া

৩। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন বাস করে?
ক. ৫০০ জন
খ. ৩৫০ জন
গ. ৮৮১ জন
ঘ. ৮০০ জন

৪। মানব উন্নয়নের ধারণার মূল বিষয় কি?
ক. মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা
খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
গ. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার
ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মানুষ শোষণের মাধ্যম নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জনসংখ্যাকে কিভাবে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়?
২। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কি 'বোঝা' হিসাবে গণ্য করা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য কি জনসংখ্যা দায়ী? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান করুন।

পাঠ - ৩

নারীর উপর জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রভাব
Impact of Population Control on Women

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি
- নারীর জন্য ক্ষতিকারক জন্মনিরোধের পদ্ধতি
- দরিদ্র বিরোধী নীতি
- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতি

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং তা প্রয়োগ করা হয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে। সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে ২০০২ সালের মধ্যে ৬০%, ২০০৫ সালের মধ্যে ৬৮% ও ২০১০ সালের মধ্যে ৭২% দম্পতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রাহকে পরিণত করা। তার মানে প্রজনন ক্ষমতার হার যা ১৯৯৭ সালে ৩.৪০% ছিল তা আরো কমিয়ে ২০০৫ সালের মধ্যে ২.২০% করা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের অর্থ বরাদ্দও অন্যান্য অনেক খাত থেকে বেশী। এই অর্থের সিংহভাগ বিদেশী সাহায্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত। বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে (demographic transition)। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ২০০৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা NRR-1 পর্যায়ে পৌঁছানো। NRR-1 একটি জনসংখ্যা বিষয়ক প্রত্যয় যা জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত হয়। Net Reproduction Rate-1 বা নীট প্রজনন হার-১ এর অর্থ প্রত্যেক মায়ের একটি করে কন্যা সন্তান থাকবে। এই প্রত্যয়টি নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে কারণ এতে নারীর সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়বে। একজন মায়ের অনেক পুত্রসন্তান থাকতে পারে কিন্তু কন্যা থাকতে পারবে না। এতে পরবর্তীতে সন্তান উৎপাদনকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের অর্থবরাদ্দ অন্যান্য অনেক খাত থেকে বেশী। এ অর্থের সিংহভাগ বিদেশী সাহায্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত।

বাংলাদেশে প্রচলিত মূল্যবোধ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নয়। নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার কম। এ কারণে সরকার জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন সমাজ কল্যাণ, নারী ও শিশু বিষয়ক, শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। লিফলেট বিতরণ, জারি গান ইত্যাদিসহ রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ পত্র, চলচ্চিত্র, সেমিনার ইত্যাদি গণমাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। ছোট পরিবার ও দুই সন্তানের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলাই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের অবকাঠামোগত সুবিধাও তৈরী করা হয়েছে। ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা contraceptives নারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ২৩,৫০০ এর উপরে সরকারী মাঠকর্মী কাজ করেন। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এখানে অনেকের চাহিদা মেটানো (unmet demand) সম্ভব হয় নি যা মেটানোর পর নতুন চাহিদা তৈরীর কর্মসূচী (creating new demand) গ্রহণ করা হবে। তার মানে প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন সকল নারীর কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ পৌঁছে দেয়াই সরকারের প্রধান টার্গেট। এতদ্ব্যতীত সরকারের পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মাধ্যমে নারীদের তিন ধরনের গ্রুপ তৈরী করা হয়েছে। এসকল গ্রুপের সদস্যগণকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

গ্রহণ করতে হয়। সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে এসকল নারীদের গ্রুপের ১.৫ মিলিয়ন নারী সদস্যগণকে ২০০২ সালের মধ্যে NRR-১ এর পর্যায়ে উন্নীত করা।

সরকারী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এনজিওগুলিও জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এনজিও এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে তৃণমূল পর্যায়ে যে গ্রুপ গঠন করা হয় সেসকল গ্রুপের সদস্যগণকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সরকারী কর্মসূচীর বাইরে সোশাল মার্কেটিং প্রোগ্রাম নামে একটি কার্যক্রমের অনুমোদন দেয়া হয় সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪০%-৫০% জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ও কনডম বিক্রয় করা হয়। এটি এত সফল হয়েছে যে বর্তমানে এর বাজেটের ৭৫% বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে আসে।

বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পানীর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পণ্যের বড় বাজারে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পানীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পণ্যের একটি বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। সরকার যে সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করে থাকে তার প্রায় সব বিদেশ থেকে আসে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে বড়ি (oral pill) গ্রহণের হার ১৯৯৭ সালে ছিল ২১% যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৩%। উক্ত সময়ে বন্ধ্যাকরণ (sterilization) বৃদ্ধি পায় ৭% থেকে ১১%, আইইউডি বৃদ্ধি পায় ৩% থেকে ৫%, ইনজেকশান বৃদ্ধি পায় ৫% থেকে ৭.৫%। উক্ত সময়ে অন্যান্য পদ্ধতি যার মধ্যে দেশীয় উপকরণ আছে তা হ্রাস পায় ৮% থেকে ৬.৫%। লক্ষণীয় যে প্রায় সকল জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণের ব্যবহারকারী নারী। পুরুষদের মধ্যে কনডম ব্যবহারকারীর হার ১৯৯৭ সনে ছিল ৪% যা ২০০১ সনে হয় ৭%। পুরুষদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। লক্ষণীয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির প্রায় সবগুলি নারীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়। পুরুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয় কেবল ভেসেকটমী। কনডম ব্যবহারে পুরুষের শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। ব্যাপারটা এমন যে নারী গর্ভধারণকারী হওয়ায় গর্ভ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত দায়ভার তাদের। নারীর শরীরে প্রয়োগযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, পিল, ক্যাপসুল, ইনজেকশান ইত্যাদি নিয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যত গবেষণা হয়েছে পুরুষের দেহে প্রয়োগযোগ্য উপকরণ আবিষ্কারের জন্য তত চেষ্টা হয় নি। বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মাধ্যমে নারীর দেহকেই জন্মনিয়ন্ত্রণের টার্গেটে পরিণত করা হয়েছে। এর অন্যতম কারণ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সাহায্যের জন্য উন্নত দেশও সাহায্য সংস্থার উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলিতে তৈরী হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী যার সহজলভ্য বাজারে পরিণত হয় উন্নয়নশীল দেশসমূহ। অনেক সময় বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান করা হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়ের শর্ত সাপেক্ষে। ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠে উন্নত দেশের ঔষধ কোম্পানীর জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর খরিদ্দার।

জন্মনিরোধ পদ্ধতির ক্ষতিকারক দিক

বাংলাদেশে যেসব পদ্ধতি নারীরা গ্রহণ করেন তার সবগুলিরই ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে।

বাংলাদেশে যেসব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নারীরা গ্রহণ করেন তার সবগুলিরই ক্ষতিকারক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এগুলি ব্যবহার করে নারীরা নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন। এসব সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলি পাশ্চাত্যের ঔষধ কোম্পানী প্রেরণ করে মানবদেহে পরীক্ষার জন্য এবং বাংলাদেশের নারীরা ব্যবহৃত হন "গিনিপিগ" হিসেবে। অনেক সময় ক্ষতিকারক বলে বিদেশে যেসব ঔষধ বাতিল হয়েছে সেসব ঔষধ বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়। অধিকাংশ সামগ্রী উন্নত দেশের স্বাস্থ্যবতী নারীদের শারিরীক অবস্থার পরিমাপে উৎপাদন করা হয়। এগুলি বাংলাদেশের দরিদ্র, পুষ্টিহীন, রুগ্ন, কৃশকায় নারীদের শারিরীক অবস্থায় মোটেও প্রয়োগযোগ্য নয়। বাংলাদেশে যে বিশাল কর্মিবাহিনী জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করেন তাদেরও এই ব্যবস্থা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। তারা নারীদের সমস্যার কথা শোনেন না এই মর্মে প্রচুর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কিন্তু কর্মীবাহিনীর চাকুরী হচ্ছে অধিকসংখ্যক নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণের গ্রাহক বানানো। সরকারী নীতি এক্ষেত্রে কঠোর হওয়ায় কর্মীবাহিনী কখনো মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও প্রলোভনের আশ্রয় নেন। আবার কখনো পুলিশী আচরণ করেন। মাঠকর্মীদের বন্ধ্যাকরণের জন্য নির্দিষ্ট টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করা তাদের চাকুরীর

শর্ত হওয়ায় জোর জবরদস্তি ও ছলচাতুরী বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলের নারীদের বিদেশী ঔষধের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ধারণা না থাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারী মাঠকর্মীদের আশ্বাসে তারা সহজেই বিশ্বাস করেন।

নরপ্লান্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নারীর শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও এ পদ্ধতি বন্ধ করা হয়নি।

বাংলাদেশে নরপ্ল্যান্ট (norplant) সিনথেটিক হরমোন ক্যাপসুল নামে একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় (ফরিদা আখতার ১৯৯৬)।[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল নরপ্ল্যান্টকে নিরাপদ ও অধিক কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করে। এই ক্যাপসুলটি নারীর হাতের চামড়ার নীচে ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে এটি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সফলভাবে গর্ভ নিরোধ করবে। পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশে এটি বিশ হাজার নারীর দেহে ঢুকানো হয়। নরপ্ল্যান্ট ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহারকারীকে দিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্রে স্বাক্ষর করনো হয় যে গ্রহীতা এই পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে স্বেচ্ছায় এটি গ্রহণ করছেন। যদিও গ্রহীতাকে বলা হয় যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলে এটি খুলে ফেলা হবে কিন্তু কার্যত তা করা যায় না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত নারী তা খুলতে গেলে তিনি তিরস্কৃত হন। বলা হয় "অনেক মূল্যবান পদ্ধতিটির অপচয় করা হচ্ছে"। বাংলাদেশে নরপ্ল্যান্টের ব্যবহারকারীগণ যেসকল সমস্যায় ভুগছেন তার মধ্যে আছে—অবিরাম রক্তপাত, মাসিক বন্ধ হওয়া, হাত পা অবশ হওয়া, হাত জ্বালাপোড়া, চুলকানো, ব্যথা, ইনফেকশন, মাথা ঘোরা ইত্যাদি। বাংলাদেশের অনেক এনজিও এই পদ্ধতির বিরোধীতা করে এবং সংবাদ পত্রে লেখালেখি হয়। তবু এই ক্ষতিকারক ও বিপদজনক নরপ্ল্যান্ট নারীদেহে পরীক্ষা করা হয়।

বাংলাদেশে গর্ভপাত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। তবু অনেক নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হওয়া কিংবা অন্য কোন কারণে গর্ভবতী হয়ে গেলে গর্ভপাত করান। গর্ভপাতের আইনগত অনুমোদন না থাকলেও স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত নারীদের গর্ভপাতের জন্য আইন শিথিল করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯৭২ সনে ৪,১৫৮ জন নারীর গর্ভপাত করানো হয়। পরবর্তীতে সরকারের মাতৃ স্বাস্থ্য রক্ষা নীতির অধীনে গর্ভপাতকে ভিন্ন নামে কার্যকর করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর নামকরণ করা হয় মাসিক নিয়মতান্ত্রিক করা বা Menstrual Regulation (MR)। MR করতে হলে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় কিংবা স্বামীর অনুমতি পত্র প্রয়োজন হয়। ক্লিনিকে MR করানো খুব ব্যয়বহুল। তাছাড়া MR পদ্ধতিতে ইনফেকশান ও জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হার অনেক বেশী। এসকল কারণে লোকজ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানীয় কবিরাজের মাধ্যমে গর্ভপাত বেশী করানো হয় (শামীমা ইসলাম, ১৯৯২)।[২] গবেষণায় আরো জানা যায় বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ গর্ভপাত করানো হয় যাতে ৭,৮০০ জন নারী মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশে গর্ভপাতের জন্য বাজার থাকায় পাশ্চাত্যের ঔষধ কোম্পানীগুলি একটি গর্ভপাতের ঔষধ বাংলাদেশে বাজারজাত করে। এটির নাম RU-486। ফ্রান্সে আবিষ্কৃত এই পিলটিকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে কারণ এতে ক্লিনিকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই পিলের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ এবং এটি ব্যবহারের সময় এবং পরবর্তীতে অন্তত চারবার ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। এর উদ্ভাবকগণ অনেক ধরনের শারীরিক অবস্থায় এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সুবিধা এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার নেই। মাঠকর্মীগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য ব্যবস্থা বিফল হলে গ্রহীতাদের গর্ভপাতের পিল দিয়ে দেন। এই গর্ভপাতের পিলের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে- দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষরণ, বমি, মাথা ঘোরানো, ডায়রিয়া, ব্যথা ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা। অনেক গ্রহীতা সময়মত রক্ত না দিতে পারায় মৃত্যুবরণ করেন। এই পিলটি বাজারজাত করার বিরুদ্ধেও বাংলাদেশে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ঔষধ কোম্পানী ছাড়াও বাংলাদেশে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও জন্মনিয়ন্ত্রণকর্মী এই ক্ষতিকারক পিল আমদানীতে লাভবান হচ্ছেন।

---

১ Akther Farida, *Depopulating Bangladesh*, Narigrantha Prabartana, Dhaka, 1996.

২ Islam Shamima, *Indigenous Abortion Practitioners in Rural Bangaldesh*, Narigrantha Prabartona, Dhaka, 1992.

বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের লোকজ ব্যবস্থার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া না থাকলেও তা উৎসাহিত করা হয় না।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের লোকজ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত আছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা ক্ষতিকারক না হলেও পাশ্চাত্যের ঔষধের প্রতিযোগিতায় সেগুলি মার খেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের একটি এনজিও 'কারিতাসে'র প্রাকৃতিক ডিম্বস্ফোটন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। এই পদ্ধতিতে কোন ঔষধ, ইনজেকশান, অপারেশানের ঝুঁকি নেই। এতে কিছু স্বাস্থ্যগত নিয়ম ও যৌন শৃঙ্খলা মেনে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পাওয়া যায়। ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ সরকার এই প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুমোদন করলেও ১৯৯২ সন থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এর প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন লোকজ ও হারবাল চিকিৎসাকে উন্নত করার জন্য কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নি।

জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি দরিদ্র বিরোধী নীতি

গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণের টার্গেট করা হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি গরীব বিরোধী নীতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীদেরকে জন্মনিয়ন্ত্রণের টার্গেট করা হয়। দরিদ্র নারীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের নিরাপদ পদ্ধতি চান। কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রকগণ যে সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে দরিদ্রদের দরজায় উপস্থিত হন, তা তাদের শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এভাবে দারিদ্র দূরীকরণের নামে চলে দরিদ্র নিধন ও দরিদ্রদের জনসংখ্যা সংকোচন। কিন্তু দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যা অত্যাবশ্যক যেমন, ভূমি, কাজ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা সস্তা জ্বালানী, বিশুদ্ধ পানি দরিদ্রদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয় না। জনসংখ্যা নীতি নারীকে প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র ও নারীর স্বাস্থ্যকে গর্ভের স্বাস্থ্যে পরিণত করা হয়েছে। সরকারী পরিকল্পনায় নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তা maternal health বা মাতৃ স্বাস্থ্য। ফলে নারীর স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী প্রকারান্তরে কেবল সন্তান জন্ম দান, গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জনসংখ্যা নীতি নারীর অধিকার প্রদানের নামে নারীকে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে। সরকারী নীতি ও এনজিও নীতিতে বলা হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রজনন ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার (reproductive rights) প্রদান করা হচ্ছে। কোন নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাকে 'আধুনিক', 'সচেতন' ইত্যাদি ক্যাটেগরিতে ফেলা হয়। জনসংখ্যা নীতি বল প্রয়োগকারী নীতিতে পরিণত হয়েছে। কারণ দরিদ্র নারী পুরুষকে শাড়ী, লুঙ্গি, অর্থ প্রদানের লোভ দেখিয়ে এবং নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সদস্য ও ঋণ গ্রহীতাদেরকেও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবিকল বহাল রেখে এবং নারী পুরুষ সম্পর্ক পরিবর্তন না করে নারীর ক্ষমতায়ন অসম্ভব ব্যাপার। বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারীর আয়ুষ্কাল কম। নারী শিশুর প্রতি অবহেলার কারণে এক বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক নারী শিশু মৃত্যুবরণ করে প্রতি এক হাজারে ১০৫ থেকে ১২৫ জন এবং পুরুষ শিশু মৃত্যুবরণ করে ৯০ থেকে ১১৫ জন। এক থেকে চার বৎসর বয়স্ক নারী শিশু মৃত্যুবরণ করে প্রতি এক হাজারে ১৬ জন এবং পুরুষ শিশু ১৩ জন। প্রতি বৎসর সন্তান জন্মদানকালে ৩০,০০০ নারী মৃত্যুবরণ করেন। নারীদের অপুষ্টির হার পুরুষের তুলনায় বেশী। বয়স্ক নারীদের ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ বয়স্ক পুরুষের তুলনায় ২৯% কম। পুরুষ শিশুদের ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ নারী শিশুদের চেয়ে তিনগুণ বেশী। তাছাড়া শিক্ষা, কর্মসংস্থান সকল ক্ষেত্রেই নারী বৈষম্যের শিকার।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্ম নিয়ন্ত্রণ

দরিদ্র নারীদের ন্যায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলিও জন্মনিয়ন্ত্রণের শিকার। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।[৩] রাখাইন ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠীটি বাংলাদেশের সমুদ্রতীরে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। এদের সংখ্যা ধীরে ধীরে অনেক হ্রাস পেয়েছে। রাখাইনদের মানব সম্পদ পরিকল্পনার জন্য নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিধান আছে। তথাপি রাখাইনদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী রাখাইন নারীদের এক চতুর্থাংশ মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারীর জাতীয় হার যখন ছিল ৪০%, তখন রাখাইনদের এই হার ছিল ৬৯%। তার মানে প্রতি তিনজন রাখাইন নারীর মধ্যে দুইজন যে কোন প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের উৎসাহ প্রদানের জন্য এই কর্মসূচীর সঙ্গে আয় উপার্জন, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার কর্মসূচীকে সমন্বিত করা হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে আয় উপার্জনের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। এভাবে দরিদ্র রাখাইন নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করায় এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

রাখাইন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করার ফলে এই এথনিক গ্রপের জনসংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

সারাংশ

বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এনজিওগুলিরও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী আছে। প্রায় সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণের ব্যবহারকারী নারী। বাংলাদেশে নারীরা যে সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন তার সবগুলিরই ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। যে সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ উন্নত দেশ সমূহে ক্ষতিকারক হওয়ার কারণে বাতিল করা হয়েছে, সেগুলিও বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের নারীগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ পরীক্ষার জন্য "গিনিপিগ" হিসেবে ব্যবহৃত হন। সাধারণত দরিদ্র নারীগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের টার্গেটে পরিণত হল।

[৩] Peoples Perspectives, *"IPPF is Targetting Tribal Community for Population Control in Bangladesh"*, No. 9810, UBINIG, Dhaka, 1994.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। Net Reproduction Rate I এর অর্থ কি?
ক. একটি ছেলে সন্তান ও একটি মেয়ে সন্তান থাকবে
খ. প্রত্যেক মায়ের একটি কন্যা সন্তান থাকবে
গ. ছেলে কিংবা মেয়ে, দুটি সন্তান থাকবে
ঘ. মেয়ে সন্তান জন্মদান আকাঙ্ক্ষিত নয়

২। R-U 486 কি ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি?
ক. পাঁচ বৎসর জন্মনিরোধক পিল
খ. এক বৎসর জন্মনিরোধক পিল
গ. গর্ভপাতের ঔষধ
ঘ. ঋতুস্রাব নিয়মিতকরণের ঔষধ

৩। কোন এনজিও প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচার করে?
ক. ব্র্যাক
খ. কারিতাস
গ. প্রশিকা
ঘ. নারী উদ্যোগ

৪। নিম্নের জন্মনিরোধক পদ্ধতির মধ্যে নারীর শরীরের উপর কোনটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সর্বাধিক?
ক. ওরাল পিল
খ. স্টেরিলাইজেশান
গ. নরপ্ল্যান্ট
ঘ. লোকজ পদ্ধতি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিকে দরিদ্রবিরোধী নীতি বলা হয় কেন?
২। রাখাইন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর উপর জন্মনিয়ন্ত্রণের কি ধরনের প্রভাব পড়ছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।
২। জন্মনিরোধক পদ্ধতি নারীর শরীরের উপর কি ধরনের ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে? আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

জনসংখ্যা সঙ্কোচনের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ
International Politics of Depopulation and Bangladesh

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন -

- বাংলাদেশে কি জনসংখ্যাধিক্য (over population) বিরাজ করছে?
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিতে সাহায্য দাতাগোষ্ঠী কিভাবে হস্তক্ষেপ করে?
- জনসংখ্যা সঙ্কোচনে দাতাগোষ্ঠীর মতাদর্শ কি?
- জনসংখ্যা সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে কি প্রতিবাদ হচ্ছে?

জনসংখ্যাধিক্যের ধারণা

জনসংখ্যাধিক্যের পরিমাপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

জনসংখ্যাধিক্য নির্ণয়ের জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব (population density) পরিমাপ করা হয়ে থাকে। কোন দেশে প্রতি বর্গ মাইলে কত মানুষ বাস করে তা দ্বারা জনসংখ্যাধিক্য ও দারিদ্র পরিমাপ করা হয়। এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হলেও সেগুলিকে জনসংখ্যাধিক্য বলে বিবেচনা করা হয় না। যেমন সুইজারল্যান্ডে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬৫ জন ও জার্মানীতে ২২৫ জন মানুষ বাস করে। কিন্তু এদেশগুলিকে জনসংখ্যাধিক্য পর্যায়ে ফেলা হয় না। অন্য দিকে ব্রাজিলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৮ জন, কেনিয়ায় ৪৩ জন ও ভারতে ২৬৭ জন মানুষ বাস করে। এ দেশগুলিকে জনসংখ্যাধিক্য পর্যায়ে ফেলা হয়। নেদারল্যান্ডে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৩১ জন মানুষ বাস করে এবং বাংলাদেশে ৮৮১ জন। কিন্তু নেদারল্যান্ডের জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা না করে এটি ধনী দেশ হিসেবে স্বীকৃত। অন্য দিকে বাংলাদেশ জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ধারণা করা হয় যে জনসংখ্যার ঘনত্ব যেসকল দেশে বেশী সেসকল দেশেই সঙ্কোচনের নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতটিই ঘটে। এখানে একটি সারণীতে তথ্য উপস্থাপিত হলো যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যাধিক্য নির্ণয়ের জন্য কোন দেশের স্বনির্ভরতা বা নিজস্ব সম্পদ দ্বারা জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই পরিমাপ যথাযথ নয়। দেখা যায় যে সুইজারল্যান্ড অন্যতম ধনী দেশ হিসেবে বিবেচিত হলেও এই দেশটি কেবল ৪০% খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় সে দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়। অন্য দিকে ভারতে উদ্বৃত্ত খাদ্যোৎপাদন সম্ভব হওয়ায় তা উন্নত দেশসমূহে রপ্তানী করা হয়। তবুও ভারতকে জনসংখ্যাধিক্যের দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার দুর্ভিক্ষকেও জনসংখ্যাধিক্যের প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো হয়। অথচ জাতিসংঘের রিপোর্টে ঘোষিত হয়েছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর মত শস্য পৃথিবীতে উৎপাদিত হয়। গবেষণা থেকে এটাও জানা যায় যে দুর্ভিক্ষ মানেই খাদ্যের অভাব বা খাদ্য ঘাটতি নয়। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা থেকে বিশেষত অমর্ত্য সেনের গবেষণা থেকেও জানা যায় যে দুর্ভিক্ষ হওয়ার বড় কারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না থাকা। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে খাদ্য মজুত থাকার পরও মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। কারণ খাদ্য উৎপাদিত হলেও বাংলাদেশে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা অসম। দারিদ্রের কারণে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের গুদামে কৃষকের প্রবেশাধিকার থাকে না।

সারণী ১ : কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী

দেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী	দেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী
হংকং	১৪,৩১৫	নাই	নামিবিয়া	৪	আছে (ইউএসএইড ও জাতিসংঘ ও দাতাগোষ্ঠীর চাপ)
সিঙ্গাপুর	১২,৩৪৭	নাই	বতসোয়ানা	৫	আছে (দাতা সংস্থাসমূহ পরিচালিত)
দক্ষিণ কোরিয়া	১১,৬৫	নাই	মৌরিতানিয়া	৫	আছে (দাতা সংস্থাসমূহের চাপ)
নেদারল্যান্ড	৯৩১	নাই	লিবিয়া	৬	নাই (দাতা সংস্থার চাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ)
জাপান	৮৪৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচী আছে	গেবন	১১	নাই (দাতা সংস্থার চাপ প্রত্যাখ্যান)
বেলজিয়াম	৮৪০	নাই	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	১২	আছে (দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ)

উৎস : Peoples Perspectives No. 9, April 1994, Dhaka.

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থার হস্তক্ষেপ

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও দাতা গোষ্ঠী বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। এ কারণে তারা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করে ও জনসংখ্যা সঙ্কোচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। লক্ষণীয় যে প্রথমে 'পরিবার পরিকল্পনা', 'জনসংখ্যা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি' ইত্যাদি শ্লোগানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমে অনুপ্রবেশ করে। ধাপে ধাপে পরিবার পরিকল্পনার বদলে জনসংখ্যা হ্রাস নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের স্বৈরাচারী ও মিলিটারী শাসনামলে জনসংখ্যা হ্রাসের নীতি সর্বোচ্চ বাস্তবায়িত হয়। ১৯৫২ সালে মার্কিন সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারী উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়। মার্কিন সাহায্য সংস্থা International Planned Parenthood Federation (IPPF) এর উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও এলিটদের সমর্থন আদায় এবং তাদের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি। মার্কিনীদের নেতৃত্বে জাতিসংঘ ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে আলোচিত হয় যে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্বের সম্পদের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৮র পর পাকিস্তানের মিলিটারী শাসক আইয়ুব খানের আমলে বিদেশী সাহায্য সংস্থা সরকারী আমলাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। আইয়ুব খানের 'ভিলেজ এইড' কার্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের নামে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ চলতে থাকে। মার্কিন সাহায্য সংস্থা ফোর্ড ফাউন্ডেশান বিপুল অর্থের যোগান দেয়।

ষাটের দশকে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ সহজে বিতরণের জন্য একটি মডেল তৈরী করে। এটি BARD এর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সংগঠন তৈরী করে আধুনিক কৃষি উপকরণ বিতরণের মডেলের অনুরূপ। বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে পাকিস্তান সরকার অগ্রাধিকার প্রদান করে। তবে সরকারের স্বাস্থ্য কর্মসূচী থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী পৃথক রাখা হয়। এতে বৈদেশিক সাহায্য দাতাগণের পক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর উপর নজরদারী করা সহজ হয়ে যায়। লক্ষণীয় যে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসনামলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপকরণ হিসেবে চালু করা হয় আই ইউ ডি ও বন্ধ্যাকরণ। এর সহযোগী হিসেবে কনডম পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়। এর অর্থ গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীগণকে সন্তান জন্মদানের বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ না রেখে তাদের দেহে জন্ম নিয়ন্ত্রক উপকরণ ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে শেষ করে ফেলা হয়। গ্রামাঞ্চলের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণে এগিয়ে না আসায় দরিদ্রদের মধ্যে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য বিতরণ করে কর্মসূচীটি উৎসাহ প্রদান করে।

১৯৭০ সাল থেকে আমেরিকার সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং ইউ এস এইড বিপুল পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশকে সাহায্য হিসেবে প্রদান করে। জাতিসংঘ বিভিন্ন উন্নত দেশের অর্থায়নে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে তহবিল গঠন করে, সে তহবিল থেকেও বাংলাদেশকে অর্থের যোগান দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গ্রামাঞ্চলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহীতাদের উৎসাহ প্রদানের নামে যে অর্থ প্রদান করা হতো সেটি বাতিল হয়ে যায়। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে মিলিটারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে আইইউডি গ্রহণের কর্মসূচী পুনর্বহাল হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণকে আরো বেগবান করার জন্য আমেরিকার একটি কোম্পানী ইনজেকশান প্রস্তুত করে।

বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলে জন্মনিয়ন্ত্রণের তীব্র নীতি বাস্তবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশের একটি বেসরকারী সংস্থা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র 'ডিপো প্রভেরা' নামের এই ইনজেকশান নারী দেহে প্রবেশ করানোর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ডিপো প্রভেরা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় আমেরিকায় তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে সকল উৎপাদন তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এই ইনজেকশান চালু রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করে।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে আমেরিকা জন্ম নিয়ন্ত্রণকে আরো বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে আমেরিকার কোম্পানী জন্ম নিয়ন্ত্রণ 'পিল' উৎপাদন করে এবং বাংলাদেশে বাজারজাত করে। এ পর্যায়ে ইউএসএইড বাংলাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পিলের 'বন্যা বইয়ে দেবার নীতি' গ্রহণ করে। এই আলোকে বাংলাদেশ সরকারের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয় যাতে সকল প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন নারীর কাছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ পৌঁছানো যায়। নারীরা চান বা না চান তাদের কাছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হাজির করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে বাংলাদেশের নারীদের দৈনন্দিন জীবন অতটা সুশৃঙ্খল নয় বলে এবং নানাবিধ কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয় বলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি সময়মত সেবনের নিয়ম তারা অনুসরণ করতে পারেন না। ইউএস এইডের জন্ম নিয়ন্ত্রণের বন্যা বইয়ে দেবার নীতি আশানুরূপ ফল লাভ না করায় তারা আরো কঠোর নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশে সরকার 'জিরো পপুলেশান গ্রোথ' বা জন্মহার শূন্য কোঠায় নামিয়ে আনার নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণকে টার্গেট করে জন্মহার ৩% থেকে কমিয়ে চার বৎসরে ০% এ নিয়ে আসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় আশির দশকে সরকার অনেকটা শাস্তিমূলক মনোভাব নিয়ে 'drastic policy' বা জন্ম নিয়ন্ত্রণে 'তীব্র নীতি' বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। ১৯৯০ সালের মধ্যে NRR-1 (পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করে তুলে। জাতিসংঘ ও মার্কিন সাহায্য সংস্থা থেকে প্রচুর অর্থের যোগান দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দুই বৎসরের 'Crash Programme' বা 'জোর পূর্বক পতনের নীতি' গ্রহণ করে।

সকল প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন দম্পতিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আওতাভূক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

আশির দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি বলপ্রয়োগকারী নীতিতে পরিণত হয়। এর ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাময়িক ব্যবস্থা যেমন পিল গ্রহণ বা কনডম ব্যবহারের পরিবর্তে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বন্ধ্যাকরণ ও এম আর (গর্ভপাত) এবং আধা স্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে আই ইউ ডি ইনজেকশান পদ্ধতি গুরুত্ব লাভ করে। বিশ্ব ব্যাংক ও ইউএস এইড এসকল কার্যক্রমে বিশেষত ব্যাপক প্রচারণার জন্য অর্থ যোগান দেয়। সরকারও অর্থ বরাদ্দ করে। বড়ি, কনডম ও লোকজ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নারীদের সন্তান নেয়া বা না নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে সুযোগ থাকে চিরস্থায়ী ও আধাস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নিপাত করা হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতি বল প্রয়োগকারী হয়ে উঠে। একজন মাঠকর্মীর প্রতি নির্দেশ থাকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ২টি বন্ধ্যাকরণ, ১টি আইইউডি, ২জন পিল গ্রহীতা, ২জন কনডম গ্রাহক ও ১জন ইনজেকশান গ্রহীতা সৃষ্টি করার জন্য। ব্যক্তি পর্যায়ে গ্রহীতাও গ্রাহকদের উৎসাহ প্রদানের নামে অর্থ প্রদান করা হয়। সামষ্টিক পর্যায়ে যে এলাকায় বন্ধ্যাকরণ, আইইউডি ও ইনজেকশান অধিক গ্রহণ করা হবে সে এলাকাকে পুরষ্কৃত করার কর্মসূচী গৃহীত হয়। বল প্রয়োগকারী নীতির ফলে বিশেষত দরিদ্র নারীগণ টার্গেটে পরিণত হন এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইতিমধ্যে নারীর গর্ভপাত ঘটানোর জন্য ও নারী দেহে জন্ম নিরোধক প্রবেশ করানোর জন্য অধিক ক্ষতিকারক দুইটি প্রযুক্তি বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়। নব্বই এর দশকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক পরিবেশ (enabling environment) সৃষ্টির লক্ষ্যে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষার নীতি গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতি একইভাবে অব্যাহত আছে এবং সকল প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন দম্পতিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

জনসংখ্যা সংকোচনে দাতাগোষ্ঠীর মতাদর্শ

জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, ও মার্কিন সাহায্য সংস্থার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতাদর্শ বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে জন্মনিয়ন্ত্রণকে এভাবে যৌক্তিক হিসেবে দাঁড় করানো হয় যে দরিদ্র পরিবারের অবশ্যই সন্তান সংখ্যা কমাতে হবে কারণ তাদের সম্পদ কম। যুক্তি প্রদান করা হয় যে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদিত না হলে বাংলাদেশে যেমন দরিদ্র মানুষ অনাহারে মৃতুবরণ করবে তেমনি বিশ্বে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। এ উদ্দেশ্যে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রযুক্তি চাপিয়ে দেয়া হয়। বলা হয় যে এই প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করলে ফসল বেশি উৎপাদিত হবে। কিন্তু এই প্রযুক্তির ফলে বাংলাদেশে পরিবেশের বিশেষত মাটি, পানি, পোকামাকড়, মাছ ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এসব দিকে দাতাগোষ্ঠী চরম অবহেলা প্রদর্শণ করে। পরবর্তীতে উন্নয়নকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আধুনিকীকরণের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণকে আবশ্যক হিসেবে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট বড় বড় বাঁধসহ নানাবিধ প্রযুক্তি জনগনকে জমিহারা ও বাস্তুহারা করে। দেখা যায় যে প্রবৃদ্ধি হলে অবধারিতভাবে মানব উন্নয়ন হয় না। অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, সুষম বন্টন না হওয়ায় এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় দারিদ্র আরো বৃদ্ধি পায়। তারপর দাতাগোষ্ঠীর মতাদর্শ এই বলে প্রচারিত হয় যে দারিদ্রের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয় এবং বিশ্বের পরিবেশকে বাঁচাতে হলে দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে অতিরিক্ত ভোগবাদিতার কারণে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অতিরিক্ত জ্বালানী পোড়ানোর জন্য বিশ্বের পরিবেশ হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। সর্বশেষে দাতাগোষ্ঠীসমূহের মতাদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে যে সন্ত্রাসের সঙ্গে দরিদ্র দেশ সমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে এবং সে কারণে তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাংলাদেশের উপরও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে যদি এদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে এবং সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দাতাগোষ্ঠীর কাছে জনসংখ্যা সঙ্কোচনের জন্য বিশ্বের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

জনসংখ্যা সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশসমূহ, জাতিসংঘ ও দাতা সংস্থাগুলির জনসংখ্যা সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ প্রতিবাদ উত্থাপন করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশসমূহ, জাতিসংঘ ও দাতা সংস্থাগুলির জনসংখ্যা সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছে। জনসংখ্যা বিষয়ক সম্মেলনগুলিতে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিদের জোরালো সমালোচনা লক্ষণীয়। পাল্টা যুক্তি প্রদান করা হয়েছে যে জনসংখ্যার সমস্যাকে বিশ্বের সম্পদের ব্যবহার ও সম্পদ বিনষ্ট করার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। উত্তর গোলার্ধের উন্নত দেশসমূহে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০% বাস করে কিন্তু তারা বিশ্বের সম্পদের ৮০% ভোগ করে এবং বিশ্বের পরিবেশ দূষণের জন্য তারা ৮০% দায়ী। উন্নত দেশসমূহে অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদনের ফলে গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট হয় এবং ওজনের (ozone) স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনসংখ্যা নীতিকে বর্ণবাদী হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশ্বের দরিদ্র, কালো ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস করে তাদের দুর্বল করার ও নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতি কাজ করছে বলেও অনেকে মনে করেন। জনসংখ্যা নীতির বিরুদ্ধে নারীবাদী সংগঠনগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কারণ নারীর প্রজনন ক্ষমতার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার মিথ্যা শ্লোগানের অন্তরালে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নারীদেরকে টার্গেট করে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করছে। জনসংখ্যা সঙ্কোচনের নীতিকে ঔপনিবেশিক শোষণ বলবৎ রাখার নতুন অস্ত্র হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে দক্ষিণ গোলার্ধের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যাই উত্তর গোলার্ধের ধনী দেশগুলির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে জনসংখ্যা নীতি বিরোধী শ্লোগানের কয়েকটি উপস্থাপিত হলো।

- "উত্তরের জন্য পরিবার প্রতি ২টি গাড়ী, দক্ষিণের জন্য পরিবার প্রতি ১ টি সন্তান" ?
- "আন্তর্জাতিক সংস্থা + বহুজাতিক কোম্পানী = জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি"
- "অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নীতি, ভোগের নিয়ন্ত্রণ নীতি চাই, কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি চাই না"
- "আমাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আড়ালে লুকানো তোমাদের মুনাফার পাহাড়"
- "আমাদের শরীর তোমাদের প্রযুক্তি পরীক্ষার যুদ্ধক্ষেত্র নয়"।

সারাংশ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নে জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক ও মার্কিন সাহায্য সংস্থা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।বাংলাদেশে গৃহীত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বিদেশী সাহায্য নির্ভর। আমেরিকার কোম্পানীগুলি জন্মনিরোধক পিল, ইনজেকশান ও অন্যান্য সামগ্রী বাংলাদেশে বাজারজাত করে। দাতা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, দারিদ্র বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দাতা সংস্থাগুলির জনসংখ্যা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবাদ উত্থাপিত হচ্ছে। জনসংখ্যা সংকোনের নীতিকে ঔপনিবেশিক শোষণ বলবৎ রাখার নতুন অস্ত্র হিসেবেও বর্ণনা করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কাদের উদ্যোগে প্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়?
ক. পাকিস্তানর সরকার
খ. বেসরকারী উদ্যোগ
গ. জাতিসংঘ
ঘ. প্রাদেশিক সরকার

২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 'বন্যা বইয়ে দেবার নীতি' এর অর্থ কি ছিল?
ক. জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সকল পুরুষ ও নারীকে সচেতন করা
খ. জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল প্রতিটি প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন নারীর কাছে পৌঁছানো
গ. জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচার
ঘ. জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহীতাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য অনুদান

৩। বাংলাদেশ সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণে 'তীব্র নীতি' বাস্তবায়নের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে?
ক. ব্যাপক প্রচারনা চালানোর পদক্ষেপ
খ. জনসংখ্যা কর্মী বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ
গ. জিরো পপুলেশন গ্রোথ বা জন্মহার শূন্যকোঠায় নামিয়ে আনার পদক্ষেপ
ঘ. জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের পদক্ষেপ

৪। বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণে কোন দেশ সর্বাধিক অর্থসাহায্য প্রদান করে?
ক. কানাডা
খ. বৃটেন
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ঘ. অস্ট্রেলিয়া

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জনসংখ্যাধিক্য কি?
২। জনসংখ্যা সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে কি ধরনের প্রতিবাদ উত্থাপিত হচ্ছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দাতাগোষ্ঠী কি ধরনের যুক্তি প্রদান করে? দাতাগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য কি?
২। বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিকে কেন অনেকে বল প্রয়োগকারী নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন? বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কি ধরনের চাপ প্রয়োগ করে আলোচনা করুন।